আল মুরসালাত

৭৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের والمرسلت শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটি মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল। এর আগের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহ্‌র এবং পরের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা আন্‌নাবা ও নাযি'আত যদি এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ। আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন ভংগিতে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের মন–মগজে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখেরাতকে প্রমাণ করা এবং এ সত্যকে অস্বীকার করলে কিংবা মেনে নিলে পরিণামে যেসব ফলাফল প্রকাশ পাবে সে বিষয়ে মক্কাবাসীদের সচেতন করে দেয়া।

কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিচ্ছেন তা যে অবশ্যই হবে প্রথম সাতটি আয়াতে বাতাসের ব্যবস্থাপনাকে তার সত্যতা ও বাস্তবতার সপক্ষে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যে অসীম ক্ষমতাশালী সত্তা পৃথিবীতে এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন তাঁর শক্তি কিয়ামত সংঘটিত করতে অক্ষম হতে পারে না। আর যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল এ ব্যবস্থাপনার পেছনে কাজ করছে তাও প্রমাণ করে যে, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া উচিত। কারণ পরম কুশলী স্রষ্টার কোন কাজই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। আখেরাত যদি না থাকে তাহলে এর অর্থ হলো, এ গোটা বিশ্ব–জাহান একেবারেই উদ্দেশ্যহীন।

মক্কাবাসীরা বারবার বলতো যে, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের ভয় দেখাচ্ছো তা এনে দেখাও। তাহলে আমরা তা মেনে নেব। ৮ থেকে ১৫ আয়াতে তাদের এ দাবীর উল্লেখ না করে এ বলে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, তা কোন খেলা বা তামাশার বস্তু নয় যে, যখনই কোন ঠাট্টাবাজ বা ভাঁড় তা দেখানোর দাবী করবে তখনই তা দেখিয়ে দেয়া হবে। সেটা তো মানব জাতি ও তার প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। সে জন্য

আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ সময় ঠিক করে রেখেছেন। ঠিক সে সময়ই তা সংঘটিত হবে। আর যখন তা আসবে তখন এমন ভয়ানক রূপ নিয়ে আসবে যে, আজ যারা ঠাট্টা–বিদ্রূপের ভংগিতে তার দাবী করছে সে সময় তারা দিশেহারা ও অস্থির হয়ে পড়বে। তখন ঐসব রসূলগণের সাক্ষ অনুসারেই এদের মোকদ্দমার ফায়সালা হবে, যাদের দেয়া খবরকে এসব আল্লাহদ্রোহী আজ অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। অতপর তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, কিভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করেছে।

১৬ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়া এবং তার অনিবার্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তার জন্ম এবং যে পৃথিবীতে সে জীবন যাপন করছে তার গঠন, আকৃতি ও বিন্যাস সাক্ষ পেশ করছে যে, কিয়ামতের আসা এবং আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার দাবীও বটে। মানুষের ইতিহাস বলছে, যেসব জাতিই আখেরাত অস্বীকার করেছে পরিণামে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ হলো, আখেরাত এমন একটি সত্য যে, যে জাতিরই আচার–আচরণ ও রীতি–নীতি এর বিপরীত হবে তার পরিণাম হবে সেই অন্ধের মত যে সামনের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা গাড়ীর দিকে বল্গাহারার মত এগিয়ে যাচ্ছে। এর আরো একটি অর্থ হলো, বিশ্ব–সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক আইন (Physical Law) কার্যকর নয়, বরং একটি নৈতিক আইনও (Moral Law) এখানে কার্যকর রয়েছে। আর এ বিধান অনুসারে এ পৃথিবীতেও কাজের প্রতিদান দেয়ার সিলসিলা বা ধারা চালু আছে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে প্রতিদানের এ বিধান যেহেতু পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারছে না, তাই বিশ্ব–জাহানের নৈতিক বিধান অনিবার্যভাবেই দাবী করে যে, এমন একটি সময় আসা উচিত যখন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে এবং সেসব ভাল ও মন্দের যথোপযুক্ত প্রতিদান বা শাস্তি দেয়া হবে যা এখানে উপযুক্ত প্রতিদান বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বা শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এর জন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন হওয়া অপরিহার্য। মানুষ দুনিয়ায় যেভাবে জন্মলাভ করে সে বিষয়ে যদি সে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক–বুদ্ধি— অবশ্য যদি সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি থাকে—এ বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে না যে, যে আল্লাহ নগণ্য বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন সে আল্লাহর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। মানুষ সারা জীবন যে পৃথিবীতে বাস করে মৃত্যুর পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় না। বরং তার দেহের এক একটি অণু পরমাণু এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীর এ মাটির ভাণ্ডার থেকেই সে সৃষ্টি হয়, বেড়ে ওঠে ও লালিত–পালিত হয় এবং পুনরায় সে পৃথিবীর মাটির ভাণ্ডারেই গচ্ছিত হয়। যে আল্লাহ মাটির এ ভাণ্ডার থেকে প্রথমবার তাকে বের করেছিলেন তাতে মিশে যাওয়ার পর তিনি তাকে পুনরায় বের করে আনতে সক্ষম। তাঁর যুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে তোমরা এ বিষয়টিও অস্বীকার করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার সঠিক ও ভুল প্রয়োগের হিসেব–নিকেশ নেয়াও নিশ্চিতভাবেই তাঁর বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার দাবী এবং বিনা হিসেবে ছেড়ে দেয়াও তার যুক্তি ও কৌশলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরপর ২৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত আয়াতে আখেরাত

অস্বীকারকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। ৪১ থেকে ৪৫ আয়াত পর্যন্ত সেসব লোকের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থেকেই নিজেদের পরিণাম গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্ম এবং নিজের জীবন ও কর্মের সমস্ত মন্দ দিক থেকে দূরে অবস্থান করেছে যা মানুষের দুনিয়ার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেও পরিণামকে ধ্বংস করে।

সবশেষে যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত আমোদ–ফূর্তি করতে চাও, করে নাও। শেষ অবধি তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ধ্বংসকর। বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআনের মাধ্যমেও যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে পারে না তাকে দুনিয়ার কোনো জিনিসই হিদায়াত দান করতে সক্ষম নয়।

আয়াত ৫০ **সূরা আল মুরসালাত–মক্কী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦ اِنَّمَا
تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧

শপথ সে (বাতাসের) যা একের পর এক প্রেরিত হয়। তারপর ঝড়ের গতিতে প্রবাহিত হয় এবং (মেঘমালাকে) বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে। অতপর (মনে আল্লাহর) স্মরণ জাগিয়ে দেয়, ওজর হিসেবে অথবা ভীতি হিসেবে।[১] যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে[২] তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।[৩]

১. অর্থাৎ কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় মন নরম হয়ে যায় এবং মানুষ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কখনো রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বয়ে আনার কারণে মানুষ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। আবার কখনো ঝড়–ঝঞ্ঝার প্রচণ্ডতা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ আল্লাহর দিকে রুজূ করে। (আরো দেখুন, পরিশিষ্ট–৩, ১৭৯ পৃষ্ঠায়)

২. এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামত এবং আখেরাত।

৩. কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তা বুঝানোর জন্য এখানে পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। এক, اَلْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا "একের পর এক বা কল্যাণ হিসেবে প্রেরিতসমূহ। দুই, اَلْعٰصِفٰتِ عَصْفًا অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিতসমূহ। তিন, اَلنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ভালভাবে বিক্ষিপ্তকারী বা ছড়িয়ে দেনেওয়ালাসমূহ। চার, اَلْفٰرِقٰتِ فَرْقًا 'বিচ্ছিন্নকারীসমূহ' পাঁচ, اَلْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا 'স্মরণকে জাগ্রতকারীসমূহ।' এ শব্দসমূহে শুধু গুণ বা বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো কিসের বিশেষণ বা গুণ তা উল্লেখ করা হয়নি। তাই এগুলো একই বস্তুর বিশেষণ না ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিশেষণ এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল বলেন, এ পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক দল বলেন যে, এ পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা

ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। তৃতীয় দল বলেন ঃ প্রথম তিনটি দ্বারা বাতাস এবং পরের দু'টি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। চতুর্থ দল বলেন ঃ প্রথম দু'টি দ্বারা বাতাস এবং পরের তিনটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। একদল এরূপ মতও পোষণ করেছেন যে, প্রথমটি দ্বারা রহমতের ফেরেশতা, দ্বিতীয়টি দ্বারা আযাবের ফেরেশতা এবং অবশিষ্ট তিনটি দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ বুঝানো হয়েছে।

আমাদের কাছে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো, যখন একই কথার মধ্যে একের পর এক পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন কোন ইংগিতও পাওয়া যাচ্ছে না যা দিয়ে বুঝা যেতে পারে যে, কোন্ পর্যন্ত একটি জিনিসের গুণ–পরিচয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোথায় থেকে আরেকটি জিনিসের গুণ পরিচয়ের বর্ণনা শুরু হয়েছে তখন অযৌক্তিকভাবে শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একথা বলা কতটা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, এখানে শুধু দু'টি বা তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে? বরং এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দাবী করে যে, সম্পূর্ণ বাক্যকে কোন একটি জিনিসের গুণ বা পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হলো, কুরআন মজীদে যেখানেই সন্দেহ পোষণকারী বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে কোন অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী সত্যকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোন জিনিস বা বস্তু বিশেষের শপথ করা হয়েছে, সেখানেই শপথ প্রমাণ উপস্থাপনের সমার্থক হয়েছে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হয় একথা বুঝানো যে, এ বস্তুটি বা বস্তু সকল সে সত্যটির যথার্থতা প্রমাণ করছে। এটা তো স্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্যে একটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুর পক্ষে আরেকটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা ঠিক নয়। বরং অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রমাণ হিসেবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রমাণ পেশ করাই যথার্থ এবং যথোপযুক্ত হতে পারে। সুতরাং আমাদের মতে এর সঠিক তাফসীর হলো এই যে, এর অর্থ বাতাস। যারা বলেছেন যে, এ পাঁচটি জিনিসের অর্থ ফেরেশতা, আমার মতে তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ফেরেশতাও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মতই অতীন্দ্রিয় বিষয়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, বাতাসের এ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিয়ামতের বাস্তবতা কিভাবে প্রমাণ করছে। যেসব উপকরণের জন্য পৃথিবীর ওপর জীব–জন্তু ও উদ্ভিদের জীবন সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বাতাস। সব প্রজাতির জীবনের সাথে বাতাসের বর্ণিত গুণাবলীর যে সম্পর্ক আছে তা এ কথারই সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন একজন মহা শক্তিমান সুনিপুণ স্রষ্টা আছেন যিনি মাটির এ গ্রহে জীবন সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে এখানে এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করলেন যার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট জীবন্ত মাখলুকাতের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার সাথে হুবহু সামঞ্জস্যশীল। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতটুকুই করেননি যে, পৃথিবীটার গায়ে বাতাসের একটি চাদর জড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। বরং নিজের কুদরত ও জ্ঞান দ্বারা তিনি এ বাতাসের মধ্যে বৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্য অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ কোটি বছর ধরে তার ব্যবস্থাপনা এভাবে হয়ে আসছে যে, সে বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে গুমট অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো স্নিগ্ধ শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কখনো গরম পড়ে আবার কখনো ঠাণ্ডা পড়ে। কখনো মেঘের ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায় আবার কখনো বাতাসে মেঘ ভেসে যায়। কখনো আরামদায়ক বাতাস বয়ে যায় আবার কখনো

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (৮) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (৯) وَإِذَا الْجِبَالُ
نُسِفَتْ (১০) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (১১) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (১২) لِيَوْمِ
الْفَصْلِ (১৩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (১৪) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (১৫)
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (১৬) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (১৭) كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ (১৮) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (১৯)

অতপর তারকাসমূহ যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে[৪] এবং আসমান ফেঁড়ে দেয়া হবে[৫] আর পাহাড় ধূনিত করা হবে এবং রসূলদের হাজির হওয়ার সময় এসে পড়বে।[৬] (সেদিন ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হবে)। কোন্ দিনের জন্য একাজ বিলম্বিত করা হয়েছে? ফায়সালার দিনের জন্য। তুমি কি জান সে ফায়সালার দিনটি কি? সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৭]

আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি?[৮] আবার পরবর্তী লোকদের তাদের অনুগামী করে দেব[৯]। অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি। সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১০]

প্রলয়ংকরী ঝড়–ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটে। কখনো অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টিপাত হয় আবার কখনো বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মোট কথা এক রকম বাতাস নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের বাতাস প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের বাতাস কোন না কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ ব্যবস্থা একটি অজেয় ও পরাক্রমশালী শক্তির প্রমাণ, যার পক্ষে জীবন সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব নয় তেমনি তাকে ধ্বংসে করে পুনরায় সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে এ ব্যবস্থাপনা পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তারও প্রমাণ। কোন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকই কেবল একথা মনে করতে পারে যে, এসব কাজ–কারবার শুধু খেলাচ্ছলে করা হচ্ছে। এর পেছনে কোন মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই। এ বিস্ময়কর ব্যবস্থার সামনে মানুষ এত অসহায় যে, সে নিজের প্রয়োজনেও কোন সময় উপকারী বাতাস প্রবাহিত করতে পারে না। আবার ধ্বংসাত্মক তুফানের আগমনকে ঠেকাতেও পারে না। সে যতই ঔদ্ধত্য, অসচেতনতা এক গুঁয়েমি ও হঠকারিতা দেখাক না কেন কোন না কোন সময় এ বাতাসই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সর্বোপরি এক মহাশক্তি তৎপর আছেন যিনি জীবনের এ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপকরণকে যখন ইচ্ছা তার জন্য রহমত এবং যখন ইচ্ছা তার জন্য ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দিতে পারেন। মানুষ তার কোন সিদ্ধান্তকেই রোধ করার ক্ষমতা রাখে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল জাসিয়া, টীকা ৭, আয্ যারিয়াত, টীকা ১ থেকে ৪।)

৪. অর্থাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং তার আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৫. অর্থাৎ যে সুদৃঢ় ব্যবস্থার কারণে উর্ধজগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যে কারণে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ আছে সে ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে এবং তার সমস্ত বন্ধন শিথিল করে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানব জাতির মামলা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে তখন প্রত্যেক জাতির রসূলকে সাক্ষদানের জন্য হাজির করা হবে। উদ্দেশ্য, তাঁরা যে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেবেন। বিপথগামী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে এটা হবে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে, তার ভ্রান্ত আচরণের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে সাবধান করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে হলে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন। তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২, ১৭৩, টীকা ১৩৪, ১৩৫; আয্ যুমার, আয়াত ৬৯, টীকা ৮০; আল মুলক, আয়াত ৮, টীকা ১৪।

৭. অর্থাৎ সেসব লোকের জন্য যারা সেদিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল এবং এ ভেবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে চলেছিল যে, এমন সময় কখনো আসবে না যখন প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ। এর অর্থ হলো, এ দুনিয়াতেই তোমরা নিজেদের ইতিহাসের প্রতি একবার তাকিয়ে দেখো। যেসব জাতি আখেরাতকে অস্বীকার করে এ দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করেছে এবং এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফলকে ভাল ও মন্দের মাপকাঠি ধরে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের নৈতিক আচরণ নিরূপণ করেছে স্থান-কাল নির্বিশেষে তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে আখেরাত এক বাস্তব সত্য। যারা একে উপেক্ষা করে কাজ করে তারা ঠিক তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে ব্যক্তি যে চোখ বন্ধ করে বাস্তবকে অস্বীকার করে চলে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা ১২; আন নাম্‌ল, টীকা ৮৬; আর রুম, টীকা ৮; সাবা, টীকা ২৫।)

৯. অর্থাৎ এটা আমার স্থায়ী নীতি ও বিধান। আখেরাতের অস্বীকৃতি অতীত জাতিগুলোর জন্য যেভাবে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে অনুরূপ অনাগত জাতিগুলোর জন্যও তা ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে। পূর্বেও কোন জাতি এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

১০. এখানে এ আয়াতটির অর্থ হলো, দুনিয়াতে তাদের যে পরিণতি হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের ওপর আসল ধ্বংস নেমে আসবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিনে। এ পৃথিবীতে যে শাস্তি দেয়া হয় তার অবস্থা হলো, যখন কোন ব্যক্তি একের পর এক অপরাধ করতে থাকে এবং কোন ভাবেই সে তার ভ্রষ্ট ও বিকৃত আচরণ থেকে বিরত হয় না তখন শেষ অবধি তাকে গ্রেফতার করা হয়। যে আদালতে তার

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ
مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ
شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

আমি কি তোমাদেরকে এক নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করিনি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য[১১] একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তা স্থাপন করেছিলাম না?[১২] তাহলে দেখো, আমি তা করতে পেরেছি। অতএব আমি অত্যন্ত নিপুণ ক্ষমতাধর।[১৩] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১৪]

আমি কি যমীনকে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানাইনি, জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য? আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা আর পান করিয়েছি তোমাদেরকে সুপেয় পানি।[১৫] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১৬]

মামলার চূড়ান্ত ফায়সালা হবে এবং তার সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে তা এ দুনিয়ায় না আখেরাতে কায়েম হবে এবং সেটাই হবে তার ধ্বংসের আসল দিন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫–৬; হূদ, টীকা ১০৫।)

১১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো قَدَرٍ مَّعْلُومٍ । এর অর্থ শুধু নির্দিষ্ট সময় নয়। বরং এর সময়–কাল একমাত্র আল্লাহই জানেন এ অর্থও এর মধ্যে শামিল। কোন বাচ্চা সম্পর্কে কোন উপায়েই মানুষ একথা জানতে পারে না যে, সে কত মাস, কত দিন, কত ঘন্টা, কত মিনিট এবং কত সেকেণ্ড মায়ের পেটে অবস্থান করবে এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্ভুল সময়টি কি? প্রত্যেক শিশুর জন্য আল্লাহ একটা বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আর সে সময়টি কেবল তিনিই জানেন।

১২. অর্থাৎ মায়ের গর্ভ থলি। গর্ভ সূচনা হওয়ার সাথে সাথে ভ্রূণকে এর মধ্যে এত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় এবং তার হিফাযত, প্রতিপালন এবং বৃদ্ধিসাধন এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয় যে, কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ছাড়া গর্ভপাত হতে পারে না। কৃত্রিম গর্ভপাতের জন্য অস্বাভাবিক ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক উন্নতি সত্ত্বেও ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত নয়।

১৩. এটা মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, যখন আমি নগণ্য এক ফোটা বীর্য থেকে সূচনা করে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে সক্ষম হয়েছি তখন পুনরায় তোমাদের অন্য কোনভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম

হবো না কেন? আমার যে সৃষ্টি কর্মের ফলশ্রুতিতে তুমি আজ জীবিত ও বর্তমান তা একথা প্রমাণ করে যে, আমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমি এমন অক্ষম নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না।

১৪. এখানে এ আয়াতাংশ যে অর্থ প্রকাশ করছে তাহলো, মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ স্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অস্বীকার করছে তারা এ নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি–তামাসা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপ করুক এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা 'সেকেলে' অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাক। যে দিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে পারবে, সেটিই তাদের জন্য ধ্বংসের দিন।

১৫. এটা আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যুক্তিসংগত হওয়ার আরো একটি প্রমাণ। পৃথিবী নামক এ একটি গ্রহ যা শত শত কোটি বছর ধরে অসংখ্য মাখলুকাতকে তার কোলে স্থান দিয়ে রেখেছে। নানা প্রকারের উদ্ভিদরাজি, নানা রকমের জীবজন্তু এবং মানুষ এর ওপরে জীবন ধারণ করছে। আর সবার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এর অভ্যন্তর থেকে নানা প্রকার জিনিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার বেরিয়ে আসছে। তাছাড়া এ পৃথিবীতে, যেখানে এসব জীবজন্তুর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিয়ত মৃত্যুবরণ করছে—এমন নজীর বিহীন ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে যে, সবার মৃতদেহ এ মাটির মধ্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রত্যেকটি সৃষ্টির নবীন সদস্যদের বেঁচে থাকার ও বসবাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে এ পৃথিবীকে বলের মত সমতল করেও সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এর স্থানে স্থানে পর্বতশ্রেণী এবং আকাশচুম্বী পাহাড় তৈরী করে রাখা হয়েছে ঋতুসমূহের পরিবর্তনে, বৃষ্টিপাত ঘটানোতে, নদ–নদীর উৎপত্তির ক্ষেত্রে, উর্বর উপত্যকা সৃষ্টিতে, কড়িকাঠ নির্মাণের মত বড় বড় বৃক্ষ উৎপাদনে, নানা রকমের খনিজ দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার পাথর সরবরাহের ক্ষেত্রে যার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া এ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুপেয় পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের ওপরেও সুপেয় পানির নদী ও খাল প্রবাহিত করা হয়েছে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন বাষ্প উত্থিত করে আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কি একথা প্রমাণ করে না যে, সর্বশক্তিমান এক সত্তাই এসব তৈরী করেছেন। আর তিনি শুধু সর্বশক্তিমানই নন বরং জ্ঞানী এবং মহাবিজ্ঞানীও বটে? অতএব, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞানের সাহায্যেই যদি এ পৃথিবী এতসব সাজ–সরঞ্জামসহ এ জ্ঞান ও কৌশলের সাথে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে একজন জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য একথাটা বুঝা এত কঠিন হবে কেন যে, এ দুনিয়ার বিলোপ ঘটিয়ে পুনরায় নতুনভাবে আরেকটি দুনিয়া তিনি বানাতে সক্ষম আর তাঁর কর্মকৌশলের দাবীও এটাই যে, তিনি আরেকটি দুনিয়া বানাবেন যাতে মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব কাজ–কর্ম করেছে তার হিসেব নেয়া যায়।

১৬. এখানে এ আয়াতাংশ এ অর্থে বলা হয়েছে যে, যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিস্ময়কর নমুনা দেখেও আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করছে এবং এ দুনিয়ার ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে

انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ
شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ
جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

চলো[১৭] এখন সে জিনিসের কাছে যাকে তোমরা মিথ্যা বলে মনে করতে। চলো সে ছায়ার কাছে যার আছে তিনটি শাখা।[১৮] যে ছায়া ঠাণ্ডা নয় আবার আগুনের শিখা থেকে রক্ষাও করে না। সে আগুন প্রাসাদের মত বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (উৎক্ষেপণের সময় যা দেখে মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের উট।[১৯] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এটি সেদিন যেদিন তারা না কিছু বলবে এবং না তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।[২০] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

এটা চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একত্রিত করেছি। তোমাদের যদি কোন অপকৌশল থেকে থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করে দেখো।[২১] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকামির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

১৭. আখেরাতের সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করার পর যখন তা বাস্তবে সংঘটিত হবে তখন সেখানে এসব অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে তা বলা হচ্ছে।

১৮. এখানে ছায়া অর্থ ধোঁয়ার ছায়া। তিনটি শাখার অর্থ হলো, যখন অনেক বেশী ধোঁয়া উত্থিত হয় তখন তা ওপরে গিয়ে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ প্রাসাদের মত বড় হবে। আর যখন এসব বড় বড় স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উটসমূহ লম্ফ ঝম্ফ করছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا
وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم
مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا
لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

২য় রুকূ'

মুত্তাকীরা[২২] আজ সুশীতল ছায়া ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করছে। আর যে ফল তারা কামনা করে (তা তাদের জন্য প্রস্তুত)। যে কাজ তোমরা করে এসেছো তার পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমরা মজা করে খাও এবং পান করো। আমি নেক্‌কার লোকদের এরূপ পুরস্কারই দিয়ে থাকি। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপ কারীদের জন্য।[২৩]

খেয়ে নাও[২৪] এবং ফূর্তি কর। কিছুদিনের জন্য[২৫] আসলে তো তোমরা অপরাধী। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর সামনে অবনত হও, তখন তারা অবনত হয় না।[২৬] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এখন এ কুরআন ছাড়া আর কোন্ বাণী এমন হতে পারে যার ওপর এরা ঈমান আনবে?[২৭]

২০. এটা হবে তাদের শেষ অবস্থা। এ অবস্থা হবে জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। এর আগে হাশরের ময়দানে তারা অনেক কিছুই বলবে। অনেক ওজর আপত্তি পেশ করবে, একজন আরেকজনের ওপর নিজের কৃত অপরাধের দোষ চাপিয়ে নিজে নিরপরাধ হওয়ার চেষ্টা করবে। যেসব নেতারা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে তাদের গালি দেবে। এমনকি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য অনুসারে, অনেকে ঔদ্ধত্যের সাথে নিজের অপরাধ অস্বীকার পর্যন্ত করবে। কিন্তু সব রকম সাক্ষ–প্রমাণের দ্বারা তাদের অপরাধী হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে এবং তাদের নিজেদের হাত, পা এবং সব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে ঃ এভাবে অপরাধ প্রমাণে যখন কোন ত্রুটি থাকবে না এবং অত্যন্ত সংগত ও যুক্তিযুক্ত পন্থায় ন্যায় ও ইনসাফের সমস্ত দাবী পূরণ করে তাদেরকে শাস্তির সিদ্ধান্ত শুনানো হবে তখন তারা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাবে এবং

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওজর হিসেবে কোন কিছু বলার সুযোগও তাদের জন্য থাকবে না। ওজর পেশ করার সুযোগ না দেয়া কিংবা তার অনুমতি না দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সাফাই পেশ করার সুযোগ না দিয়েই তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয়া হবে। বরং এর অর্থ হলো, এমন অকাট্য ও অনস্বীকার্যভাবে তাদের অপরাধ প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ওজর হিসেবে কিছু বলতেই পারবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন আমরা বলে থাকি যে, আমি তাকে বলতে দিইনি, কিংবা আমি তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। একথার অর্থ এই যে, আমি এমনভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি যে, তার মুখ খোলার বা কিছু বলার কোন সুযোগ থাকেনি এবং সে লা-জবাব হয়ে গেছে।

২১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তো তোমরা অনেক কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতে। এখন এখানে কোন কৌশল বা আশ্রয় নিয়ে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারলে তা একটু করে দেখাও।

২২. এখানে এ শব্দটি যেহেতু مُكَذِّبِيْنَ (মিথ্যা আরোপকারীদের) বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে তাই মুত্তাকী শব্দ বলে এখানে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছে এবং আখেরাতকে মেনে নিয়ে এ বিশ্বাসে জীবন যাপন করেছে যে, আখেরাতে আমাদেরকে নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম এবং স্বভাব চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২৩. এখানে যে অর্থে এ আয়াতাংশ বলা হয়েছে তাহলো, তাদের জন্য একটি বিপদ হবে তাই যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হাশরের ময়দানে অপরাধী হিসেবে উঠবে। তাদের অপরাধ প্রকাশ্যে এভাবে প্রমাণ করা হবে যে, তাদের জন্য মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না এবং পরিণামে তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য মসিবতের ওপর মসিবত হবে এই যে, যেসব ঈমানদারদের সাথে তাদের সারা জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও লড়াই হয়েছে, যাদের তারা নির্বোধ, সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করতো, যাদের নিয়ে তারা হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ করতো এবং যাদের তারা নিজেদের দৃষ্টিতে হীন, নীচ ও লাঞ্ছিত মনে করতো তাদেরকেই তারা জান্নাতের মধ্যে আরাম আয়েশের জীবন যাপন করে আমোদ ফূর্তি করতে দেখবে।

২৪. এখন বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে শুধু মক্কার কাফের নয় বরং সারা পৃথিবীর কাফেরদের সম্বোধন করে একথাগুলো বলা হয়েছে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার এ স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে।

২৬. আল্লাহর সামনে আনত হওয়ার অর্থ শুধু তাঁর ইবাদাত বন্দেগী করাই নয়, বরং তাঁর প্রেরিত রসূল এবং নাযিলকৃত কিতাবকে স্বীকার করা এবং তার বিধি-বিধানের আনুগত্যও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার এবং হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যা হতে পারতো তা কুরআন আকারে নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন পড়ে বা শুনেও যদি কেউ ঈমান না আনে তাহলে একে বাদ দিয়ে আর কোন্ জিনিস এমন হতে পারে যা তাকে সত্য পথে আনতে সক্ষম?

পরিশিষ্ট—৩

১নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতগুলোতে প্রথমত বৃষ্টি বহনকারী বাতাসসমূহের পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, প্রথমে ক্রমাগত বাতাস চলতে থাকে। পরে তা ঝঞ্ঝার রূপ ধারণ করে। তারপর মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। অতপর তাকে বিদীর্ণ করে ভাগ ভাগ করে। এরপর বৃষ্টি নামার কথা উল্লেখ করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, তা মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণকে জাগ্রত করে, ওজর হিসেবে কিংবা ভীতি হিসেবে। অর্থাৎ সেটি এমন এক সময়ে ঘটে, যখন মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, তাই সে আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কিংবা মানুষ তার দোষ-ত্রুটি ও অপরাধসমূহ স্বীকার করে দোয়া করতে থাকে, যেন আল্লাহ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার প্রতি দয়া করে যেন রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয়ে থাকে এবং এক ফোঁটা পানির জন্য মানুষ কাতরাতে থাকে তাহলে সে অবস্থায় ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হতে এবং বৃষ্টির মেঘ আসতে দেখে অনেক সময় কট্টর কাফেরও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। তবে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্র বা হাল্কা হলে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ যারা তারা সাধারণত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাই স্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ হলেও তারা তাঁকে স্মরণ করবে। কিন্তু অন্যরা তখনও সাইন্সের বুলি কপচাতে থাকবে এবং বলবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অমুক অমুক কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না। এতটুকু ব্যাপার নিয়ে দোয়া করতে শুরু করা দুর্বল আকীদা-বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই না। তবে যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে এবং গোটা দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তাহলে বড় বড় কাফেরদেরও তখন আল্লাহকে মনে পড়তে থাকে। মুখে বলতে লজ্জাবোধ করলেও তারা নিজের গোনাহ ও পাপ এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জা অনুভব করে এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করে যে, বাতাস বৃষ্টির যে মেঘ বহন করে আনছে তা থেকে যেন গোটা দেশে বৃষ্টিপাত হয়। এটাই হলো ওজর হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলা। এরপর نُذُرًا (ভীতি) হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারটা সংঘটিত হয় তখন যখন ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রচণ্ড বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে এবং জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত করে ফেলে কিংবা মুষলধারে এমন বৃষ্টি হতে থাকে যে, তা বিপদ সংকুল প্লাবনের রূপ ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের কাফেরও আতংকগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতে থাকে। তখন তার মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশ থেকে ঝড় ও প্লাবনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যা উবে যায়। বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এ অনুক্রম বা পারম্পর্য বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে, এসব বাতাস ওজর কিংবা ভীতি হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়। অন্য কথায় যেন বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় যেসব ব্যবস্থা চলছে তা মানুষকে এ সত্যটিই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ পৃথিবীর সবকিছু তার ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং সবকিছুর ওপরে এক মহাশক্তি আছেন যিনি মানুষের ভাগ্যের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর ক্ষমতা এমন অপরাজেয় যে, যখন ইচ্ছা তিনি সমস্ত উপাদানকে মানুষের লালন ও প্রতিপালনের জন্য

ব্যবহার করতে পারেন। আবার যখন ইচ্ছা ঐ সব উপাদানকেই তার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

এরপর বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে কি সাক্ষ–প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত দু'টি প্রশ্নে সংশয়–সন্দেহে নিপতিত হয় এবং বিব্রত বোধ করে। এক, কিয়ামত হওয়া সম্ভব কিনা? দুই, এর প্রয়োজনই বা কি? এ প্রশ্নের জটা জালে জড়িয়েই তার মধ্যে এ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কিয়ামত কি আদৌ সংঘটিত হবে? নাকি এটা একটা কাহিনী মাত্র? এ বিষয়ে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা থেকে প্রমাণ পেশ করে তার সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় প্রমাণ পেশ করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাহলো, আল্লাহ আ'আলার বিশাল সাম্রাজ্যের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে কোন কোনটার শপথ করে বলা হয়েছে যে, তা সংঘটিত হবে। এ পন্থায় প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তার সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদিও এসে যায়।

এখানেও প্রমাণ পেশের এ পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বায়ু প্রবাহের আবর্তন এবং বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনাকে এ বিষয়ে নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এটা একটা নিয়মিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা যা একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তার ব্যবস্থাপনায় কায়েম হয়েছে। এটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোন ঘটনা নয় যে, তার প্রভাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আপনা থেকেই এ পন্থা–পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে এবং আপনা আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প উত্থিত হয়েছে, বাতাস তা বহন করে নিয়ে গিয়েছে এবং তা একত্র করে বৃষ্টির মেঘ সৃষ্টি করেছে। অতপর সে মেঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছে দিয়েছে এবং আপনা আপনি তা থেকে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কোন বিচার–বিবেচনা ও বুদ্ধি–বিবেকহীন প্রকৃতি কোন নিয়ম–নীতি ও আইন–কানুন বিহীন রাজত্বে আকস্মিকভাবে এ ব্যবস্থাটি চালু করেনি। বরং এটা একটা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যা একটি বিধান মোতাবেক যথারীতি চলছে। সুতরাং সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি থেকে বাষ্প উত্থিত হওয়ার পরিবর্তে তা জমে বরফে পরিণত হচ্ছে এমনটা কখনো দেখা যায় না। বরং সূর্যরশ্মির উত্তাপে সমুদ্রের পানি থেকে সবসময় বাষ্পই উত্থিত হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ এমন উল্টো আচরণ কখনো করে না যে, বাষ্পীভূত পানিকে স্থলভাগের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সমুদ্রেই তাকে নিঃশেষ করে দিল। বরং তা বাষ্পকে সবসময় ওপরে উঠিয়ে নেয়। এমনও কখনো ঘটতে দেখা যায় না যে, মেঘমালা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাতাস এসব মেঘ বহন করে শুষ্ক ভূ–ভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করেছে এবং শুষ্ক ভূ–ভাগের ওপরে বৃষ্টিপাত একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি বছর থেকে একই নিয়মে এ ব্যবস্থা লাগাতার চলে আসছে। এমনটি যদি না হতো, এ পৃথিবীর বুকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্বলাভ করা ও বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

এ ব্যবস্থার মধ্যে আপনি একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমুখিতা এবং সুশৃঙ্খল বিধান কার্যকর দেখতে পাচ্ছেন। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, এ বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সাথে পৃথিবীর মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজির জীবনের একটা অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পানির এ সরবরাহ প্রাণীকূলকে সৃষ্টি করা ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঠিক তার প্রয়োজন অনুসারে একটি নিয়ম বিধান মোতাবেক করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যমুখিতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা শুধু এ একটি ব্যাপারে নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনায়ই তা দেখা যায় এবং মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি এর ওপরই নির্ভরশীল। আপনি একেকটি জিনিস সম্পর্কে জেনে নেন যে, তা কি কাজে লাগে এবং কোন্ নিয়ম অনুসারে কাজ করে। তারপর যে জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনি যতটা জানতে পারেন তা কোন্ কাজে লাগে এবং কোন্ নিয়ম–বিধি অনুসারে কাজ করে তাকে কাজে লাগানোর ততটাই নতুন নতুন পন্থা–পদ্ধতি আপনি উদ্ভাবন করতে থাকেন এবং নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের তামাদ্দুন ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করতে থাকেন। এ পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে আর এখানকার প্রতিটি জিনিসই একটি অলংঘনীয় নিয়ম–বিধান ও শৃংখলা অনুসারে কাজ করছে এ মর্মে একটি স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ধারণা যদি আপনার মন–মস্তিষ্কে না থাকতো তাহলে আপনার মগজে কোন জিনিস সম্পর্কে এ প্রশ্ন আদৌ জাগতো না যে, তা কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে এবং তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এখন এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিস যদি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে, যদি এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা কার্যকর থেকে থাকে আর যদি তা শত শত কোটি বছর ধরে একাদিক্রমে এ উদ্দেশ্য এবং নিয়ম–বিধি ও শৃংখলা অনুসারে চলে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন একগুঁয়ে ও হঠকারী মানুষই কেবল একথা অস্বীকার করতে পারে যে, একজন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই আহমকী যে, এ পৃথিবীকে তিনি বানাতে এবং পরিচালনা করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তা ধ্বংস করতে পারেন না এবং ধ্বংস করার পর ইচ্ছা করলে তা অন্য কোন আকৃতিতে পুনরায় বানাতেও পারেন না। প্রাচীনকালের অজ্ঞ নাস্তিকদের একটা বড় হাতিয়ার ছিল বস্তুর অবিনশ্বর ও অবিনাশী হওয়ার ধারণা। কিন্তু জ্ঞান–বিজ্ঞানের অগ্রগতি তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এখন এটা জ্ঞানগতভাবে স্বীকৃত সত্য যে, বস্তু শক্তিতে (Energy) রূপান্তরিত হতে পারে এবং শক্তিও বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই একথা সম্পূর্ণরূপে বিবেক–বুদ্ধিসম্মত যে, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ তা'আলা এ বস্তুজগতকে যতদিন পর্যন্ত কায়েম রাখবেন ততদিন পর্যন্ত তা কায়েম থাকবে। কিন্তু যখনিই তিনি একে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চাইবেন শুধু একটি ইংগিতেই তা করতে পারবেন। তাছাড়া এ শক্তিকে আবার অন্য একটি বস্তুর আকৃতিতে সৃষ্টি করার জন্যও তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট।

এ হলো কিয়ামতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কথা। কোন তাত্বিক বা যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে এটাকে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এখন যে প্রশ্নটি থেকে যায় তাহলো, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া দরকার যাতে মানুষকে তার ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া যায়। যে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক দায় দায়িত্ব স্বীকার করে এবং

একথাও স্বীকার করে যে, উত্তম কাজের পুরস্কার লাভ এবং অপরাধের শাস্তি ভোগ এ নৈতিক দায় দায়িত্বের অনিবার্য দাবী সে ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতের অনিবার্যতা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই যা প্রতিটি অপরাধ ও দুষ্কর্মের শাস্তি এবং প্রতিটি ভাল কাজের পুরস্কার দিতে পারে। অপরাধীর জন্য তার বিবেকের দংশন ও তিরস্কার এবং উপকার ও সুকৃতিকারীর জন্য তার মনের তৃপ্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি যথোপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার, একথা বলা একটি নিরর্থক দর্শন কপচানো ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার পর কোন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাকে তিরস্কার করার জন্য তার বিবেক এত সময় কোথায় পেল? আর সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অকস্মাত একটি বোমার আঘাতে যার গোটা দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সে যে একটি মহত উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবন কুরবানী করলো তার বিবেক এ তৃপ্তি ও প্রশান্তিলাভের সুযোগ পেল কখন? আসল কথা হলো, আখেরাত বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলার জন্য যত বাহানা ও ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয় তা সবই অর্থহীন। মানুষের বিবেক–বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি ইনসাফ কামনা করে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে ইনসাফ পাওয়া তাও আবার যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গরূপে কখনো সম্ভব নয়। এরূপ ইনসাফ হলে তা আখেরাতেই হওয়া সম্ভব এবং সমস্ত জ্ঞানের আধার ও সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত আল্লাহ্ আ'আলার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব। আখেরাতের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের প্রয়োজনকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

জ্ঞান ও যুক্তি–বুদ্ধি মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে যে, আখেরাত সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত। কিন্তু তা অবশ্যই সংঘটিত হবে এ জ্ঞান কেবল অহীর মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। আর অহী একথা বলে দিয়েছে যে, "যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আমরা এ জ্ঞানের নাগাল পেতে পারি না। তবে তা সত্য ও ন্যায়ানুগ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এভাবে লাভ করতে পারি যে, অহী আমাদের যে বিষয়ের খবর দিচ্ছে তা হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও বটে।